ইউনিট

৩ সিন্ধু সভ্যতা

ভূমিকা

মেসোপটেমিয়া ও মিশরের মতো ভারতেও নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন সভ্যতা। নব্যপ্রস্তর যুগে খাদ্য ও ঘাসের অভাব দেখা দিলে ভারতের বিভিন্ন অংশের মানুষ নদীর তীরে বসতি গড়তে থাকে। কারণ, নিজেদের এবং পশুর খাদ্যের যোগান সহজ হতে পারে নদীর তীরেই। এভাবে, সিন্ধু নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল ভারতের প্রাচীন সভ্যতা - সিন্ধু সভ্যতা। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোকে ভিত্তি করে গড়ে উঠা সিন্ধু সভ্যতা আশেপাশের আরও বেশ কিছু অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। সিন্ধু সভ্যতায় পাওয়া লিপি পাঠ করা সম্ভব হয়নি। তাই, এই সভ্যতার রাজনৈতিক ইতিহাস তেমনভাবে জানা যায় না। তবে, ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া দ্রব্য সামগ্রী থেকে এই সভ্যতার অগ্রগতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায়। সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষগুলো প্রমাণ করে প্রাচীনকালে এখানে উন্নত নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। নগর যেমন ছিল পরিকল্পিত, একই সাথে এখানে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনেও একটা পরিকল্পনার ছাপ লক্ষ করা যায়। উত্থান, বিকাশ এবং পতন সভ্যতার একটি অবধারিত নিয়ম। এই নিয়ম এড়াতে পারেনি সিন্ধু সভ্যতা। এক সময় অবসান ঘটে এই সভ্যতার।

পাঠ ১

সিন্ধু সভ্যতার পরিচিতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- কখন এবং কিভাবে সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কার করা হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সিন্ধু সভ্যতা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তার বিবরন দিতে পারবেন।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর অবস্থান

প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বুঝতে পেরেছিলেন, সিন্ধু নদের তীরে প্রাচীন সভ্যতার অস্তিত্ব থাকতে পারে। তাই অনেকদিন থেকেই এই অঞ্চল ঘিরে অনুসন্ধান চলছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ হরপ্পা অঞ্চলে খনন শুরু করেন ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে। হরপ্পার অবস্থান বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাবের সাহিওয়াল জেলায়। মহেঞ্জোদারো অঞ্চলে খনন কাজ শুরু হয় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধুদেশে লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদারোর অবস্থান। এরপর থেকে ক্রমাগত খনন কাজ চলতে থাকে এবং ধীরে ধীরে বেরোতে থাকে এই সভ্যতার বিস্ময়কর সব নিদর্শন। হরপ্পার চেয়ে ঐতিহাসিক নিদর্শন মহেঞ্জোদারোতে বেশি পাওয়া যায়। এ কারণে ঐতিহাসিকদের অনেকে সিন্ধু সভ্যতাকে মহেঞ্জোদারো সভ্যতা বলেছেন। আবার কারও বর্ণনায় হরপ্পার সংস্কৃতি গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। তাঁদের নিকট সিন্ধু সভ্যতা হরপ্পা সংস্কৃতি নামে পরিচিত।

হরপ্পার অবস্থান বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাবের সাহিওয়াল জেলায়।

পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধুদেশে লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদারোর অবস্থান।

সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল

সিন্ধু সভ্যতায় কিছু সীল পাওয়া গিয়েছে। সীলগুলোর গায়ে ছিল লিপি খোদিত। এ দেখে পণ্ডিতদের অনুমান সিন্ধু সভ্যতায় মানুষেরা লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিল। এ সময়ের সাহিত্যের কোন সূত্র পাওয়া যায়নি। তাই, সিন্ধু সভ্যতা জানার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ বিশ্লেষণ করতে হয়। সিন্ধু সভ্যতায় পাওয়া মাটির পাত্রের সাথে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার মাটির পাত্রের মিল রয়েছে। সিন্ধুর সীল সুমেরীয় সভ্যতার বিভিন্ন প্রত্নস্থলে পাওয়া গিয়েছে। এসব বিচারে প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার জন মার্শাল সিদ্ধান্ত

নিয়েছেন যে, সিন্ধু সভ্যতার সবচেয়ে গৌরবের সময় ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫০ থেকে ২৭৫০ অব্দের মধ্যে। ঐতিহাসিক আইভার রিজনার সিন্ধু সভ্যতার উদ্ভবকাল মনে করেন ৩৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার মর্টিমার হুইলার। তাঁর মতে, সিন্ধু সভ্যতা শুরু হয়েছিল ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

সিন্ধু সভ্যতার সবচেয়ে গৌরবের সময় ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫০ থেকে ২৭৫০ অব্দের মধ্যে।

মহেঞ্জোদারো নগরীর আবিষ্কার

মহেঞ্জোদারো সভ্যতা আবিষ্কারে প্রধান কৃতিত্ব একজন বাঙ্গালীর। তিনি ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়। তিনি মহেঞ্জোদারো সভ্যতা আবিষ্কার করেন ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। সিন্ধি ভাষায় মহেঞ্জোদারো শব্দের অর্থ হল মৃতের সমাধি বা স্তূপ। এরও দুই বছর আগে হরপ্পায় অনুরূপ সংস্কৃতি আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কার করেন ঐতিহাসিক দয়ারাম সাহনি। এ সময় স্যার জন মার্শাল ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মহাপরিচালক ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় এই দুই অঞ্চলে ব্যাপক খননকার্য শুরু হয়। সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারে তিনজন প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষ ভুমিকা রেখেছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন কাশীনাথ দীক্ষিত, ননী গোপাল মজুমদার এবং স্যার মর্টিমার হুইলার।

মহেঞ্জোদারো সভ্যতা আবিষ্কারে প্রধান কৃতিত্ব একজন বাঙ্গালীর। তিনি ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়।

মসিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারে তিনজন প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষ ভুমিকা রেখেছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন কাশীনাথ দীক্ষিত, ননী গোপাল মজুমদার এবং স্যার মর্টিমার হুইলার।

সিন্ধু সভ্যতার বিস্তার

প্রথমদিকে ধারণা করা হতো, সিন্ধু নদীর তীরে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এ কারণেই সভ্যতাটির নাম দেয়া হয়েছিল সিন্ধু সভ্যতা। পরে, কালিবঙ্গান নামের অঞ্চলে মাটি খুঁড়ে পাওয়া যায় আরও একটি শহরের ধ্বংসাবশেষ। অঞ্চলটি বর্তমান ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্তে পুরনো সরস্বতী নদীর তীরে। এরপর থেকে চারপাশের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ধান মিলতে থাকে পুরনো সংস্কৃতির। এতে বুঝা যায় সিন্ধু সভ্যতা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। সিন্ধু সভ্যতার যুগের আরেকটি সংস্কৃতির সন্ধান মিলে নর্মদা নদীর মোহনায়। হরপ্পা সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল সৌরাষ্ট্র, কাথিওয়ার এবং গুজরাটে। এছাড়াও রাজস্থানে সিন্ধুর অন্তর্গত চানহুদারোতে এবং আহমদাবাদের লোথালে। বাণিজ্যের প্রয়োজনে সিন্ধু সভ্যতার মানুষ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। আধুনিক ইতিহাসবিদদের মতে, হরপ্পা সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল পশ্চিম ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যবর্তী সীমান্ত, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ এবং ক্যাম্বে উপসাগর পর্যন্ত। মনে করা হয়, হরপ্পার মানুষ পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে নতুন নতুন অঞ্চল অধিকার করেছিল। হরিয়ানার অন্তর্গত রূপারে ও উত্তর প্রদেশের আলমগীরপুরে এই সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

হরপ্পা সংস্কৃতির কিছুকাল আগে মহেঞ্জোদারো সংস্কৃতির পত্তন ঘটেছিল। পাকিস্তানের কোটদিজি, আমরি, ঝুকার, মঙ্গার প্রভৃতি অঞ্চলে এ সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো মিলে গড়ে উঠা সিন্ধু সভ্যতার বিস্তারকে একটি সীমারেখায় টানা যায় - উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে ক্যাম্বে উপসাগর আরব সাগর এবং পশ্চিমে ইরান-পাকিস্তান সীমান্ত থেকে পূর্বে ভারতের উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত। প্রাচীন ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে এক বিশাল এলাকা জুড়ে এই সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল।

সার-সংক্ষেপ

সিন্ধু সভ্যতা ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার প্রথম নিদর্শন। প্রধানত সিন্ধু নদের তীরে এই সভ্যতা গড়ে উঠলেও এর বিস্তার ঘটেছিল বিশাল অঞ্চলব্যাপী। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সিন্ধু সভ্যতার প্রাচীনতম নির্দশন। একই সময়ের সংস্কৃতি নতুন নতুন আরও অনেক অঞ্চলে আবিষ্কার করা হয়েছে। এই সকল সংস্কৃতি একত্রিতভাবে সিন্ধু সভ্যতা নামে পরিচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। স্যার মর্টিমার হুইলার এর মতে সিন্ধু সভ্যতা শুরু হয়েছিল–
   ক. ২৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।
   খ. ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।
   গ. ৩৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

২। মহেঞ্জোদারো সভ্যতা আবিষ্কারের প্রধান কৃতিত্বের দাবিদার–
ক. স্যার জন মার্শাল।
খ. ননী গোপাল মজুমদার।
গ. রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়।

৩। ১৯২২ সালে আবিষ্কার করা হয়–
ক. হরপ্পা সংস্কৃতি।
খ. মহেঞ্জোদারো সংস্কৃতি।
গ. সোয়ান সংস্কৃতি।

৪। হরপ্পা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল–
ক. মহেঞ্জোদারো সংস্কৃতির আগে।
খ. মহেঞ্জোদারো সংস্কৃতির পরে।
গ. একই সময়ে।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর অবস্থান নির্ণয় করুন।
২. সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের ইতিহাস বর্ণনা করুন।
৩. মহোঞ্জোদারো নগরীর অবিষ্কার সম্পর্কে বর্ণনা দিন।
৪. সিন্ধু সভ্যতার বিস্তৃতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ ২

হরপ্পা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- হরপ্পা নগরীর পরিচয় জানতে পারবেন।
- হরপ্পা নগরীর নির্মাতা কারা সে সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- হরপ্পা সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

হরপ্পা নগরীর পরিচয়

হরপ্পা সভ্যতার মানুষেরা প্রথম গ্রামীণ জীবন পরিত্যাগ করে চমৎকার নগর গড়ে তুলেছিল।

পাঠ- ১ এ, আপনারা সিন্ধু সভ্যতার পরিচয় পেয়েছেন। এই সভ্যতার প্রধান দুই নগর হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর সাথে পরিচয় হয়েছে। বর্তমান পাঠে এই হরপ্পা অঞ্চলে গড়ে উঠা সংস্কৃতির সাথে আপনারা পরিচিত হবেন। হরপ্পা সভ্যতার মানুষেরা প্রথম গ্রামীণ জীবন পরিত্যাগ করে চমৎকার নগর গড়ে তুলেছিল। এই নগরের পরিকল্পনা দেখে ধারণা করা যায় যে, নগরবাসী সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে গড়ে তুলেছিল নগরটিকে।

হরপ্পা নগরের সমতলভূমির সীমা ছিল আড়াই মাইল। সিন্ধুর উপনদী রাভীর তীরে গড়ে উঠেছিল হরপ্পা নগরী। নগরের দু'টো প্রধান অংশ ছিল। একটি অংশ সংরক্ষিত এলাকা বা দুর্গ। ধনী ও অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা দুর্গ এলাকায় বসবাস করতো। আর দরিদ্র মানুষদের বাস ছিল শহরের অন্য অংশে। দুর্গের বাইরে গড়ে উঠেছিল প্রকৃত শহর। হরপ্পা নগরের রাস্তাগুলো ছিল সোজা। কোথাও কোন বাঁক ছিল না। রাস্তাগুলো বেশ প্রশস্ত ছিল। প্রধান সড়কের প্রশস্ততা ছিল ৩৫ ফুট। সবচেয়ে কম প্রশস্ত রাস্তাটি ছিল ১০ ফুটের। এছাড়াও ছোট ছোট কিছু গলিপথও ছিল। যেগুলো ৫ ফুট চওড়া হত। সড়কের প্রান্তসীমার বাড়ীগুলো বৃত্তাকারে তৈরি করা হতো। ধারণা করা হয় সড়ক দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্যই এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। নগরবাসীদের পানি সরবরাহের চমৎকার ব্যবস্থা ছিল। পথের ধারে কূপ খনন করা হতো। অনেক বাড়ির উঠোনেও কূপ ছিল। নগর জীবন পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য মাটির নীচে ড্রেন বানানো হতো। পৃথিবীর সকল প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে সিন্ধু সভ্যতার এই ব্যবস্থাই ছিল সবচেয়ে আধুনিক। এছাড়াও বাড়িগুলোতে ছিল স্নানাগার ও ময়লা পানি বের হওয়ার উপযোগী ড্রেন। নগর কর্তৃপক্ষ রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যে পথের পাশে ডাষ্টবিন রাখার ব্যবস্থা ছিল। বাইরের শত্রু যাতে আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শহরের পশ্চিম প্রান্তে তৈরি করা হয়েছিল সুরক্ষিত দুর্গ।

পৃথিবীর সকল প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে সিন্ধু সভ্যতার এই ব্যবস্থাই ছিল সবচেয়ে আধুনিক।

হরপ্পা নগরীর নির্মাতা

কোন্ জাতি হরপ্পা নগরী সৃষ্টি করেছে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। কোন কোন পণ্ডিতের ধারণা হরপ্পা শহর সৃষ্টি হয়েছিল আর্যদের আগমনের পূর্বে। তাই দ্রাবিড়ভাষী এক জাতি এই সংস্কৃতির স্রষ্টা। অপরদিকে কেউ কেউ মনে করেন, আর্যরা হরপ্পা সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে। তাঁদের মতে, হরপ্পা সংস্কৃতি বৈদিক সংস্কৃতির অংশবিশেষ। এছাড়াও হরপ্পা সংস্কৃতির স্রষ্টা কে তা নিয়ে আরও কিছু মত আছে। এই মত অনুযায়ী সুমেরীয়, পছণি, অসূর, ব্রাত্য, বাহীক, দাস, নাগ, ব্রাহুই প্রভৃতি জাতি সম্প্রদায় ও ভাষার লোকেরা হরপ্পা সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছিল বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু, এ নিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁরা হরপ্পা অঞ্চলে খনন কার্যের পর যে সমস্ত নরকঙ্কাল বা মানুষের দেহের অংশবিশেষ পাওয়া গিয়েছে তার উপর ভিত্তি করে একটি সিদ্ধান্তে এসেছেন। তাঁরা মনে করেন হরপ্পা সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন জাতির মিলিত চেষ্টায়।

স্থাপত্য

হরপ্পায় তিন ধরনের স্থাপত্য খুজে পাওয়া গিয়েছে তা হল, সাধারন ঘরবাড়ি, বৃহৎ প্রাসাদসমূহ দূর্গ।

হরপ্পায় একটি উন্নত নগরীই শুধু গড়ে উঠেনি, একটি উজ্জ্বল সংস্কৃতিরও বিকাশ ঘটেছিল। স্থাপত্য শিল্পের চমৎকার বিকাশ ঘটেছিল এখানে। তিন ধরনের স্থাপত্য খুঁজে পাওয়া গিয়েছে হরপ্পায়। এগুলো হচ্ছে সাধারণ ঘরবাড়ি, বৃহৎ প্রাসাদসমূহ এবং দুর্গ। হরপ্পায় বিভিন্ন আকৃতির বসতবাড়ির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কোথাও দ্বি-কক্ষ, কোথাও পাঁচ কক্ষ বিশিষ্ট বাড়ির নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

একাধিক তলার ঘরবাড়িরও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বিশাল আকৃতির বেশ কিছু চমৎকার প্রাসাদ পাওয়া গিয়েছে। মনে করা হয় রাজপুরুষদের বসবাসের জন্য এগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল। হরপ্পায় ১৬৯ ফুট দীর্ঘ ও ১৩৫ ফুট প্রশস্ত শস্যাগার ছিল। শস্য জমা রাখার জন্য সম্পূর্ণ শষ্যাগারটি ৫০ ফুট দীর্ঘ ও ২০ ফুট প্রশস্ত অনেকগুলো কক্ষে বিভক্ত করা হয়েছিল। শস্য যাতে নষ্ট না হয় সে জন্য কক্ষগুলোতে প্রয়োজনীয় বাতাস প্রবাহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। মনে করা হয়, রাজস্ব হিসেবে জনসাধারণের কাছ থেকে শস্য আদায় করে এখানে জমা রাখা হতো।

হরপ্পা সভ্যতার সীল ও দ্রব্য সামগ্রী

পাথর ও ব্রোঞ্জের তৈরি প্রচুর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে হরপ্পায়। প্রাপ্ত পোড়ামাটির মূর্তি হরপ্পা সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন। পোড়ামাটির ছোট ছোট মানুষ ও জীবজন্তুর মূর্তি অনেক দক্ষতার পরিচয় বহন করে।

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত সীলমোহর

হরপ্পায় চারকোণা আকৃতির বেশ কিছু সীল পাওয়া গিয়েছে। সীলে চমৎকারভাবে চিত্রলিপি অঙ্কন করা হতো। সীলে সাধারণত ষাঁড়, মহিষ প্রভৃতি পশুর প্রতিকৃতি খোদাই করা হতো। মনে করা হয়-কিছুটা ধর্মীয়, কিছুটা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল সীলগুলো। বাণিজ্যের প্রয়োজনে হরপ্পানদের মালপত্রের সাথে এসব সীলও পাঠানো হতো। প্রমাণ হিসাবে মেসোপটেমিয়ার উর, কিশ প্রভৃতি অঞ্চলে পাওয়া সীল উল্লেখযোগ্য। এসব ছাড়াও হরপ্পায় পাওয়া দ্রব্যের মধ্যে খেলনা, অলঙ্কার, মৃৎপাত্র, ধাতুদ্রব্য ইত্যাদি প্রধান। হরপ্পায় মাটির তৈরি দুই চাকার ষাঁড়ের খেলনা গাড়ি পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও পোড়ামাটি ও তামার এক্কাগাড়ি, পাখি প্রভৃতির কথা বলা যেতে পারে। স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জের অলঙ্কার তৈরি হতো হরপ্পায়। কুমারেরা মসৃণ মৃৎপাত্র তৈরি করতো। মাটি ও ধাতুর তৈজসপত্র পাওয়া গিয়েছে হরপ্পায়। হরপ্পায় দ্রব্য সামগ্রী ওজন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বাটখারা ব্যবহার করা হতো। ওজন সম্পর্কে ধারণা থেকে বুঝা যায় সে যুগে হরপ্পায় গণিতের চর্চা করা হতো। জ্যামিতি সম্পর্কে জ্ঞান ছিল বলেই তারা চমৎকার নগর পরিকল্পনা তৈরি করতে পেরেছিল। এভাবে হরপ্পার বিভিন্ন নিদর্শন বিচার করে এই অঞ্চলের উন্নত সংস্কৃতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায়।

মহেঞ্জোদড়ো প্রাপ্ত পশুপতি মূর্তি

সার-সংক্ষেপ

সিন্ধু সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছিল হরপ্পা। এখানে উন্নত সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। মনে করা হয় দ্রাবিড় জাতি কোন এক কালে এই সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। অবশ্য এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, নগর পরিকল্পনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে হরপ্পা। হরপ্পা সংস্কৃতি সিন্ধু সভ্যতারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। হরপ্পা নগরের আয়তন–
   ক. আড়াই মাইল।
   খ. পাঁচ মাইল।
   গ. দশ মাইল।

২। হরপ্পা সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে–
   ক. আর্যরা।
   খ. দ্রাবিড়রা।
   গ. বিভিন্ন জাতি মিলিতভাবে।

৩। হরপ্পার বৃহৎ প্রাসাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–
   ক. বৃহৎ স্নানাগার।
   খ. রাজ প্রাসাদ।
   গ. শষ্যাগার।

৪. হরপ্পায় পাওয়া সীলে খোদিত থাকতো–
   ক. বর্ণ লিপি।
   খ. চিত্র লিপি।
   গ. প্রতীকী লিপি।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হরপ্পা নগরীর পরিচয় দিন।
২. হরপ্পায় প্রাপ্ত সামগ্রীর বিবরণ দিন।

পাঠ ৩

মহেঞ্জোদারো

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- মহেঞ্জোদারো শহরের নগর পরিকল্পনা কেমন ছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মহেঞ্জোদারোতে যে একটি উন্নত পরিমাপ পদ্ধতির বিকাশ ঘটেছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মহেঞ্জোদারোর শিল্পকলা সম্পর্কে বিবরন দিতে পারবেন।

নগর পরিকল্পনা

পাঠ- ১ এ আপনারা জেনেছেন, পাকিস্তানের অন্তর্গত লারকানা জেলায় সিন্ধুর মহেঞ্জোদারোর অবস্থান। মহেঞ্জোদারো সংস্কৃতি হরপ্পা সংস্কৃতিরই অনুরূপ ছিল। মহেঞ্জোদারোতেও গড়ে উঠেছিল একটি নগর। নগর পরিকল্পনা ছিল হরপ্পারই অনুরূপ। রাস্তাঘাট, দুর্গ, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সবকিছুই মিলে যায় হরপ্পার সাথে। মহেঞ্জোদারো নগরের প্রতিটি বাড়িতে একটি করে স্নানাগার এবং ময়লা পানি বের হওযার জন্য ড্রেনের ব্যবস্থা ছিল। শহরের ময়লা পানি বের হওয়ার জন্য পয়:প্রণালী ছিল। এই ড্রেনের সাথেই যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন বসত বাড়ির ড্রেনগুলো। ড্রেনগুলো কোনটি মাটির উপরে আবার কোনটি মাটির নীচ দিয়ে তৈরি করা হতো। ড্রেন তৈরিতে ব্যবহার করা হত পোড়ানো ইট। ড্রেনের পানি গিয়ে পড়ত সরাসরি নদীতে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ প্রমাণ পেয়েছেন যে, ড্রেনের পাইপগুলো মাঝে মাঝে পরিষ্কার করানো হতো। শহরের এবং বাড়িঘরের জঞ্জাল ফেলার জন্য জায়গায় জায়গায় ডাস্টবিন রাখা হতো। হরপ্পার মত মহেঞ্জোদারোতেও ছিল সড়ক বাতির ব্যবস্থা। বাইরের আক্রমণ থেকে নগরকে রক্ষা করার জন্য হরপ্পার মতো এখানেও দুর্গ তৈরি করা হয়েছিল। এই দুর্গ ছিল নগরের পশ্চিম পাশে। এভাবেই একটি চমৎকার পরিকল্পনায় পৃথিবীর প্রাচীনতম নগরের অন্যতম মহেঞ্জোদারোর নগর গড়ে উঠে।

পাকিস্তানের অন্তর্গত লারকানা জেলায় সিন্ধুর মহেঞ্জোদারোর অবস্থান।

ওজন ও পরিমাপ

মহেঞ্জোদারো নগরের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বাণিজ্যের অবস্থা যে ভাল ছিল তা এই সভ্যতায় পাওয়া নিদর্শন থেকে জানা যায়। দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় ও বিক্রয় করার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি সঠিক পরিমাপ পদ্ধতি। ওজনের জন্য নগরবাসীরা বিভিন্ন পরিমাপের বাটখারা ব্যবহার করতো। ছোট বাটখারাগুলোর আকৃতি ছিল চারকোণা। আর বড়গুলো ছিল গোলাকার। কোন কোনটি ছিল কিছুটা কৌণিক। সাধারণত পাথর দিযে বাটখারা তৈরি করা হতো। বাটখারাগুলোর ওজন সমান থাকায় ধারণা করা হয় ওজনের ব্যাপারে সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা সতর্ক ছিল। বড় বড় এবং ভারি জিনিস ওজন করার জন্য মহেঞ্জোদারোর নগরবাসীরা ব্রোঞ্জের স্কেল ব্যবহার করতো। ভারি বস্তু ওজন করার জন্য কাঠখন্ড ব্যবহার করা হতো। কাঠখন্ডের এক প্রান্তে দ্রব্য বেঁধে ওজন করা হতো। কোন জিনিসের দৈর্ঘ্য মাপার জন্য মহেঞ্জোদারোর মানুষেরা স্কেল ব্যবহার করত। তাদের স্কেলের দৈর্ঘ্য ছিল ২০.৬২ ইঞ্চির সমান। পরিমাপদন্ডে নির্দিষ্ট ঘর কাটা হতো।

ওজনের জন্য নগরবাসীরা বিভিন্ন পরিমাপের বাটখারা ব্যবহার করতো।

বৃহৎ হল, বৃহৎ স্নানাগার, পাথর ও ব্রোঞ্জের মূর্তি

শিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহেঞ্জোদারো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। নগরবাসীদের জন্য পাকা ঘরবাড়ি তৈরি করা হতো। এ সমস্ত ঘরবাড়ি ছিল বহু কক্ষবিশিষ্ট। সদর রাস্তার দিকে মুখ করা থাকতো বাড়ির প্রবেশ দরজাগুলো। বাড়িগুলোতে শয়ন কক্ষ ছাড়াও কুয়ো এবং স্নানাগার থাকতো। এছাড়াও রান্নাঘর, গুদামঘর প্রভৃতিরও ব্যবস্থা রাখা হতো। মহেঞ্জোদারোর ঘরবাড়ি দেখে ধারণা করা যায় নগরবাসীরা বিলাসবহুল, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করতো। বেশ কিছু চমৎকার প্রাসাদের নিদর্শন পাওয়া গেছে মহেঞ্জোদারোতে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল 'বৃহৎ হল'। এই হলঘরটি ৮০ ফুট দীর্ঘ জায়গা জুড়ে তৈরি করা হয়েছিল। হলঘরের ভিতরে পাতা ছিল সারি সারি বেঞ্চ। বেঞ্চগুলোর সামনে ছিল প্লাটফরম। প্রশস্ত বারান্দা ছিল হলঘরের সামনে। পণ্ডিতদের বিচারে এটি ছিল মহেঞ্জোদারো নগরের সভাগৃহ। মহেঞ্জোদারোতে ২৩০×৭৮ ফুটের প্রকান্ড প্রাসাদ আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাসাদের চারপাশে ছিল পুরু দেয়াল। অনুমান করা হয় এটি শাসকদের প্রাসাদ ছিল। মহেঞ্জোদারোর বৃহৎ স্নানাগার নামে

বেশ কিছু চমৎকার প্রাসাদের নিদর্শন পাওয়া গেছে মহেঞ্জোদারোতে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল 'বৃহৎ হল'।

মহেঞ্জোদারোর বৃহৎ স্নানাগার নামে পরিচিত একটি প্রকান্ড স্থাপত্য নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।

পরিচিত একটি প্রকান্ড স্থাপত্য নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। বৃহৎ স্নানাগারের ঘরটি ১৮০ ফুট দীর্ঘ ও ১০৮ ফুট প্রশস্ত। প্রাসাদের কেন্দ্রে ছিল সাঁতার কাটার উপযোগী একটি বিশাল চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চাটি ৩৯ ফুট দীর্ঘ, ২৩ ফুট প্রশস্ত ও ৮ ফুট গভীর ছিল। এটি যুক্ত করা ছিল একটি কুয়োর সাথে। ব্যবহৃত পানি ড্রেনের মাধ্যমে বের করে দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। স্নানাগারের দেয়াল ছিল ইটের তৈরি। দেয়ালের গায়ে সুরকি, জিপসাম ও বিটুমিনের প্রলেপ দেয়া হতো। স্নানাগারের চারপাশে ছিল বারান্দা। যারা গোসল করতে আসত বারান্দার পেছনের তিন দিকে তাদের জন্য ছিল কক্ষ ও গ্যালারি। ধারণা করা হয়, বৃহৎ স্নানাগারটি দ্বি-তল ছিল এবং সেখানে অনেক কক্ষ ছিল। কেউ কেউ মনে করেন এই স্নানাগারটি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল।

হরপ্পার মত মহেঞ্জোদারোতেও একটি বিশাল দুর্গ ছিল।

হরপ্পার মত মহেঞ্জোদারোতেও একটি বিশাল দুর্গ ছিল। দুর্গের দৈর্ঘ্য ছিল ১২০০ ফুট এবং প্রস্থ ৬০০ ফুট। দুর্গের চারদিকে ৪০ ফুট উঁচু প্রতিরক্ষা দেয়াল ছিল। দূর্গের দেয়াল তৈরি করা হত কাদামাটি ও রোদে শুকানো ইট দিয়ে । দুর্গের বাইরের অংশে ৪ ফুট পুরু পোড়ানো ইটের আরেকটি অতিরিক্ত দেয়াল ছিল। হরপ্পার মত মহেঞ্জোদারোতেও পাথর এবং ব্রোঞ্জের তৈরি অনেক মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এই মূর্তিগুলোর মধ্যে সুপরিচিত হচ্ছে নরম পাথরের তৈরি একটি পুরুষ মূর্তি। শিল্পী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দাড়ি, চোখ, কান, নাক প্রভৃতি নির্মাণ করেছিলেন। এছাড়াও কিছু চমৎকার ব্রোঞ্জ মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। নৃত্যরতা মেয়ের মূর্তি এর এক উজ্জ্বল নিদর্শন। মেয়ে মূর্তিটির ডান হাত কোমরের উপর ছিল। বাম হাত ও পুরো বাহু জুড়ে পরানো ছিল বালা। হাতটি আল্‌তোভাবে পায়ের উপরে রাখা ছিল। মহেঞ্জোদারোতে বেশ কিছু ব্রোঞ্জের পশুমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখ করা যায় নিখুঁতভাবে তৈরি ষাঁড় ও ছাগলের মূর্তি। পোড়ামাটির কিছু মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে মহেঞ্জোদারোতে। হরপ্পার মতো এখানেও প্রচুর সীল পাওয়া গিয়েছে। শিল্পীগণ অত্যন্ত দক্ষতা ও নিপুণতার সাথে ছুরি, ছোট বাটালি, ছেদক এবং করাত দিয়ে পাথর কেটে এসব সীল তৈরি করতো। মহেঞ্জোদারোতে কুমারের চাকায় তৈরি অনেক মসৃণ মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়েছে। এ সমস্ত নিদর্শনের মধ্য দিয়ে মহেঞ্জোদারো সংস্কৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

সার-সংক্ষেপ

সিন্ধু সভ্যতার অন্যতম নগর মহেঞ্জোদারো। হরপ্পার সাথে মিল এই নগরের। মহেঞ্জোদারোর নগর পরিকল্পনা ছিল সে যুগের বিচারে অনেকটা আধুনিক। আকর্ষণীয় নগর গড়ার পাশাপাশি বাণিজ্যেরও অগ্রগতি হয়েছিল মহেঞ্জোদারোতে। শিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছিল মহেঞ্জোদারোর মানুষেরা। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নির্মাণে মহেঞ্জোদারোর মানুষ যে যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দেখাতে পেরেছে তা আবিষ্কৃত বিভিন্ন নিদর্শন থেকে জানা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। মহেঞ্জোদারো অবস্থিত–
   ক. পাঞ্জাবে।
   খ. সিন্ধুতে।
   গ. রাজস্থানে।

২। মহেঞ্জোদারোর বৃহৎ প্রাসাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–
   ক. বৃহৎ দুর্গ।
   খ. বৃহৎ হল।
   গ. বৃহৎ প্রাসাদ।

৩। বৃহৎ স্নানাগারের ঘরটি–
ক. ১৮০ ফুট দীর্ঘ।
খ. ১০৮ ফুট দীর্ঘ।
গ. ২৩ ফুট দীর্ঘ।

৪। মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া কুমারের চাকায় তৈরি হতো–
ক. মূর্তি।
খ. অস্ত্র।
গ. মসৃণ মৃৎপাত্র।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. মহেঞ্জোদারো শহরের নগর পরিকল্পনা কেমন ছিল বর্ণনা করুন।
২. মহেঞ্জোদারোতে যে একটি উন্নত পরিমাপ পদ্ধতির বিকাশ ঘটেছিল - তার ব্যাখ্যা দিন।

পাঠ ৪

সিন্ধু সভ্যতার অবদান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- সিন্ধু সভ্যতার সমাজ জীবন কেমন ছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সিন্ধু সভ্যতার অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সিন্ধু সভ্যতার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- সিন্ধু সভ্যতার লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে বিবরন দিতে পারবেন।

বিভিন্ন পেশার মানুষের বাস

সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া দ্রব্যসামগ্রী বিশ্লেষণ করে এই সভ্যতার মানুষ কিভাবে সমাজজীবনের বিকাশ ঘটিয়েছিল তা জানা যায়। সিন্ধু সভ্যতায় একদিকে যেমন মূল্যবান ধাতুর অলঙ্কার ও বাসনকোসন পাওয়া গিয়েছে, অন্যদিকে কম মূল্যের ধাতু ও পোড়ামাটির দ্রব্যাদিও পাওয়া গিয়েছে। এ থেকে ধারণা করা হয় সমাজে বিভিন্ন আয়ের লোক বসবাস করতো। কেউ কৃষিকাজ করত, কেউ বস্ত্র বয়ণ করতো, কেউ বানাতো মৃৎপাত্র। আবার কারও পেশা ছিল ইট তৈরি।

সিন্ধু সভ্যতার আদর্শ

শহরবাসীদের জীবন

বড় বড় ঘরবাড়ি দেখে বোঝা যায়, শহরবাসীরা বেশ স্বচ্ছল ছিল। পূর্ববর্তী পাঠে মহেঞ্জোদারোতে নৃত্যরতা মেয়ের মূর্তির কথা জেনেছেন। এই মূর্তি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শহরবাসীদের মধ্যে নৃত্যশিল্পের প্রচলন ছিল। সবকিছু বিচারে ধারণা করা হয় বেশ সংগঠিত একটি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল মহোঞ্জোদারো বাসীরা।

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ

ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া নিদর্শন প্রমাণ করে অন্ততঃ মহেঞ্জোদারোতে চার শ্রেণীর মানুষ বসবাস করত। ১. শিক্ষিত শ্রেণী ২. যোদ্ধা শ্রেণী ৩. ব্যবসায়ী ও কারিগর শ্রেণী এবং ৪. শ্রমজীবী শ্রেণী। চার ধরনের পেশার মানুষ শিক্ষিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এরা হচ্ছেন, পুরোহিত, চিকিৎসক, জ্যোতিষী এবং যাজক। সিন্ধু সভ্যতায় পাওয়া দুর্গ, পাহারাদারদের ঘর ও যুদ্ধাস্ত্র দেখে অনুমান করা হয় যে, একটি যোদ্ধা শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল এখানে। তৃতীয় শ্রেণীতে অনেক ধরনের পেশার মানুষ অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেমন- রাজমিস্ত্রী, লিপিকর, শাঁখারী, স্বর্ণকার, তাঁতী, ছুতোর ইত্যাদি। গৃহকাজে নিয়োজিত শ্রমিক, কৃষক, মুটে প্রভৃতি পেশার লোক চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত ছিল।

খাদ্য

নগরবাসীরা গরু, ছাগল, শুকর, হাঁস-মুরগী, কচ্ছপ ইত্যাদির মাংস খেতো। তবে, গম ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। যব এবং খেজুরও তাদের প্রিয় খাদ্য ছিল। মাছ খুবই সাধারণ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সব্জি, ফল, দুধ ইত্যাদিও সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা খেতো বলে অনুমান করা হয়।

অর্থনৈতিক অবস্থা

সিন্ধু সভ্যতার অর্থনৈতিক অবস্থা জানার জন্য এ অঞ্চলের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের দিকগুলোকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সবকিছু বিচারে অনুমান করা হয় সিন্ধু সভ্যতায় একটি জমজমাট অর্থনেতিক অবস্থা বিরাজ করত।

কারিগরি শিল্পের বিকাশ

এই সভ্যতার মানুষের প্রধান পেশা ছিল কৃষিকাজ। প্রধান কৃষিপণ্য ছিল গম, বার্লি ও তুলা। কৃষিকাজে ব্যবহার করা হত ষাঁড়। কৃষিকাজের জন্য কারিগররা বিভিন্ন কৃষি উপযোগী যন্ত্রপাতি তৈরি করতো। তামা ও ব্রোঞ্জের অস্ত্র ও ব্যবহার্য দ্রব্য ধাতব শিল্পের অগ্রগতির কথা প্রমাণ করে। তবে, সিন্ধুবাসীরা লোহার ব্যবহার জানতো না। বয়নশিল্পীরা তুলা ও রেশমী বস্ত্র বয়ন করতো। নির্মাণ কার্যে ব্যবহার

করা হতো কাঁচা এবং আগুনে পোড়া ইট। এসব ছাড়াও হাতির দাঁতের চিরুনী, সূঁচ, কাঠের হাতলযুক্ত তামা ও ব্রোঞ্জের আয়না, মৃৎপাত্র, সীল প্রভৃতি ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠেছিল।

বৈদেশিক বাণিজ্য

সিন্ধু সভ্যতার কারিগররা প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশি পণ্য উৎপাদন করতো। এগুলো তারা রপ্তানি করতো। ভারতের বাইরে অনেক দেশে। এসব পণ্যের ব্যাপক চাহিদা ছিল। ফলে, বিভিন্ন দেশের সাথে পারস্য, আফগানিস্তান, মেসোপটেমিয়া ও মিশ্বর মিশরের সাথে সিন্ধু সভ্যতার বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠে।

দক্ষ সরকার ব্যবস্থা এবং ধর্ম সম্পর্কে ধারণা

সিন্ধু সভ্যতায় একটি দক্ষ সরকার ব্যবস্থা ছিল।

আপনারা সিন্ধু সভ্যতায় যে সুন্দর পরিকল্পিত নগর দেখেছেন তাতে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন নগরবাসীদের জীবনও ছিল পরিকল্পিত। এ থেকে পণ্ডিতগণ ধারণা করেছেন যে সিন্ধু সভ্যতায় একটি দক্ষ সরকার ব্যবস্থা ছিল। নগর জীবন পরিচালনা ছাড়াও ব্যাপক বৈদেশিক বাণিজ্য, নিয়ন্ত্রিত ওজন ও পরিমাপের ব্যবস্থা, বড় সভাগৃহ, স্নানাগার, শস্যাগার এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, বড় সভাগৃহ, স্নানাগার, শস্যাগার এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একটি দক্ষ এবং নিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থার প্রমাণ বহন করে। এই সভ্যতার অনেক নিদর্শন থেকে এ যুগের ধর্মীয় অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা নেয়া যায়। পোড়ামাটির মূর্তিগুলো অধিকাংশই ছিল মহিলার প্রতিমূর্তি। এ থেকে অনুমান করা হয় মাতৃপূজার প্রচলন ছিল সিন্ধু সভ্যতায়। পুরুষ দেবতার কথাও জানা যায় মূর্তি থেকে। একটি সীলে তিন মুখ বিশিষ্ট পুরুষ দেবতার মূর্তি ছিল। সিংহাসনে আসন পেতে বসেছেন দেবতা। তাঁর মাথায় ছিল শিং। দেবতার চারপাশে ছিল মহিষ, বাঘ, হাতি, গন্ডার। আসনের নীচে ছিল একটি হরিণ। দেবতার হাতে পরা ছিল অনেকগুলো বাজুবন্দ। আর গায়ে ছিল বিচিত্র পোশাক। এই দেবতা অনেক নামে পরিচিত। যেমন- 'ত্রিমুখা', 'যোগেশ্বর,', 'মহাযোগী' অথবা পশুপতি। তবে, অনেকেই এই দেবতাকে 'শিব' বলে মনে করেন। সীলের গায়ে খোদাই করা ছবি থেকে আরও ধারণা করা যায়, সিন্ধু সভ্যতার মানুষেরা সূর্য, নদী, সর্প, বৃক্ষ ও পাখির পূজা করতো। এ যুগে কবরে মৃতের ব্যবহার করা দ্রব্যসামগ্রী রেখে দেয়া হতো। এ থেকে ধারণা করা হয়, সিন্ধু সভ্যতার মানুষেরা মৃত্যুর পরে আরেক জীবনের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। কবর দেয়া ছাড়াও মৃতদেহ পোড়ানোর রীতিও প্রচলিত ছিল।

সিন্ধু সভ্যতার মানুষেরা মৃত্যুর পরে আরেক জীবনের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল।

সিন্ধু সভ্যতার লিপি

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু সভ্যতায় ২৫০০টি সীল পাওয়া গিয়েছে। এই সীলগুলোতে ছিল কিছু লিপি যা ছবির মতোই আঁকা। কিন্তু, এই লিপি সম্পূর্ণভাবে পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। আধুনিককালে এই লিপি পাঠ করতে এগিয়ে এসেছিলেন ভারতের একজন প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ। তাঁর নাম শ্রী এস,আর, রাও। তিনি এই লিপির কিছুটা পাঠোদ্ধার করতে পেরেছেন। শ্রী রাও ৩৬০ টি শব্দ থেকে ৩০ টি শব্দ বের করে দেখিয়েছেন যে সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের একটি বড় অংশ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথমদিকে সিন্ধু সভ্যতায় ৩৬০ টি চিহ্ন লেখার জন্য ব্যবহার করা হতো। ২৭৫০ খ্রিস্টপূর্বকে শেষ হরপ্পা যুগ বলা হয়। এ সময় চিহ্ন সংখ্যা কমে এসে ২০ টিতে দাঁড়ায়। হরপ্পা লিপি হিসেবে পরিচিত এই ২০ টি চিহ্নের মধ্যে ১৪ টি ছিল বিদেশী চিহ্ন। ধারণা করা হয়, এগুলো ক্যানানীয় অথবা প্যালেস্টিনীয় অথবা ফিনিশীয় চিহ্ন। পন্ডিতদের অনুমান বাণিজ্য করতে গিয়ে সিন্ধু সভ্যতার বণিকরা এসব অঞ্চলের সাথে পরিচিত হয়েছিল এবং এদের কাছ থেকে নিয়েছিল লেখার দীক্ষা ।

সার-সংক্ষেপ

বিশ্ব সভ্যতায় সিন্ধু সভ্যতা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। একটি পরিকল্পিত নগর সভ্যতা গড়ে তুলেছিল সিন্ধু অঞ্চলের অধিবাসীরা। সিন্ধু সভ্যতায় একটি চমৎকার এবং পরিকল্পিত সমাজ জীবন গড়ে উঠেছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সিন্ধুবাসীরা সমৃদ্ধি অর্জন করতে পেরেছিল। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বনিকরা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। একটি সুসংগঠিত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন গড়ে উঠেছিল সিন্ধু সভ্যতায়। এখানে প্রাপ্ত বিভিন্ন নিদর্শন থেকে সিন্ধু সভ্যতার সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে জানা যায়। সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা যে একটি লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিল তা জানতে পারা যায় এখানে পাওয়া সীলগুলো পরীক্ষা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। মহেঞ্জোদারোর অধিবাসীরা বিভক্ত ছিল–
ক. তিন শ্রেণীতে।
খ. চার শ্রেণীতে।
গ. পাঁচ শ্রেণীতে।

২। সিন্ধু সভ্যতার মানুষের প্রধান পেশা ছিল–
ক. বাণিজ্য।
খ. কৃষিকাজ।
গ. যুদ্ধ।

৩। পোড়ামাটির মূর্তিগুলোর অধিকাংশই ছিল–
ক. মহিলার প্রতিমূর্তি।
খ. পুরুষের প্রতিমূর্তি।
গ. পশুর প্রতিমূর্তি।

৪। সিন্ধু সভ্যতার লিপি কিছুটা পাঠোদ্ধার করেছেন–
ক. স্যার জন মার্শাল।
খ. রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়।
গ. শ্রী এস.আর.রাও।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. সিন্ধু সভ্যতার অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে বর্ণনা করুন।
২. সিন্ধু সভ্যতার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
৩. সিন্ধু সভ্যতার লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে কি জানা যায় আলোচনা করুন।

পাঠ ৫

সিন্ধু সভ্যতার নির্মাতা ও সভ্যতার পতন।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- সিন্ধু সভ্যতা কারা নির্মাণ করেছেন সে সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- কিভাবে সিন্ধু সভ্যতার পতন ঘটেছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।

সিন্ধু সভ্যতার প্রকৃত নির্মাতা

সিন্ধু সভ্যতা কারা গড়ে তুলেছিল তা ঠিক নিশ্চিত করে বলা যায় না। এ নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। সিন্ধু সভ্যতার মানুষের কঙ্কাল নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। গবেষণার ফল থেকে নৃতত্ত্ববিদগণ মনে করেন, এই সভ্যতার অধিবাসীরা ছিল দ্রাবিড়, অস্ট্রোলয়েড, ভূ-মধ্যসাগরীয় মঙ্গোলীয় এবং আলপানীয় গোত্রভুক্ত। তবে এদের মধ্যে দ্রাবিড়দের সংখ্যাই ছিল বেশি। এ কারণে অধিকাংশ পণ্ডিতের ভাষ্য সিন্ধু সভ্যতার প্রকৃত নির্মাতা হচ্ছে দ্রাবিড়রা। এ কারণেই সিন্ধু সভ্যতার সংস্কৃতি দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতি নামে পরিচিত।

অধিকাংশ পণ্ডিতের ভাষ্য সিন্ধু সভ্যতার প্রকৃত নির্মাতা হচ্ছে দ্রাবিড়রা।

সিন্ধু সভ্যতা গড়ায় আর্যদের ভূমিকা না থাকার কারণসমূহ ঃ

এক সময় বলা হতো আর্যরা সিন্ধু সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। কিন্তু, কতগুলো যুক্তিতে এই মত গ্রহণ করা যায় না।

১. সিন্ধু সভ্যতার নির্দশন থেকে বোঝা যায়, এই সভ্যতার অধিবাসীরা লিঙ্গ পূজা করতো। কিন্তু, আর্যরা ঘৃণা করতো লিঙ্গ পূজা।

২. আর্যদের প্রিয় পশু ছিল ঘোড়া। কিন্তু, সিন্ধু সভ্যতায় কোন ঘোড়ার কঙ্কাল পাওয়া যায়নি। সিন্ধু সভ্যতায় পাওয়া সীলগুলো থেকে জানা যায় এ অঞ্চলে প্রধান পশু ছিল ষাঁড়।

৩. সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা নগর গড়ে তুলেছিল। নগর সভ্যতায় তারা ছিল অভ্যস্ত। কিন্তু, আর্যরা নগর নির্মাণ করেনি। নগর ধ্বংস করেছে।

৪. আর্যরা মৃত ব্যক্তিকে আগুনে পোড়াত। কিন্তু, সিন্ধু সভ্যতায় অনেক সমাধিক্ষেত্র পাওয়া যায়। বোঝা যায় যে, এখানে প্রধানত মৃতদেহকে কবর দেয়া হতো।

৫. আর্যরা লিখতে জানতো না। লিখন পদ্ধতির প্রচলন আর্য সভ্যতায় প্রথম দিকে দেখা যায়নি। কিন্তু, সিন্ধু সভ্যতার মানুষেরা যে লিখতে পারতো তার প্রমাণ সীলগুলো থেকে পাওয়া গেছে।

৬. সিন্ধু সভ্যতা যে আর্যরা গড়ে তোলেনি তার বড় প্রমাণ হচ্ছে মৃৎপাত্র। আর্য সভ্যতা যতোদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে সেসব অঞ্চলে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়েছে। আর্যযুগের মৃৎপত্রের রং ছিল ধূসর। কিন্তু, সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রে যে সব মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়েছে- সেগুলোর রং ছিল কালো-লাল।

৭. সিন্ধু সভ্যতা ছিল কৃষিভিত্তিক সভ্যতা। অন্যদিকে, আর্যরা প্রথমদিকে কৃষিকাজ জানতো না। তারা ছিল যাযাবর।

এসব কিছুর বিচারে সিন্ধু সভ্যতা যে আর্যদের গড়া নয় বরঞ্চ দ্রাবিড়রাই এই সভ্যতা গড়ে তুলেছিল।

সিন্ধুসভ্যতার পতনের কারণ

সভ্যতার ইতিহাসের নিয়মই হচ্ছে কোন একটি সভ্যতার উত্থান ঘটতে পারে, তারপরে এর বিকাশ, অবশেষে এর পরিণতি হয় পতন। এই নিয়ম এড়াতে পারেনি সিন্ধু সভ্যতাও। এক সময়ের উন্নত এই সভ্যতা শেষ পর্যন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিভাবে সিন্ধু সভ্যতার পতন ঘটেছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে, কিছু কিছু প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে অনুমান করা চলে। সম্ভবত: সিন্ধু সভ্যতা পতনের জন্য বেশ কিছু কারণ দায়ী ছিল।

ক. প্রাকৃতিক দুর্যোগ

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। দুই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা বলা হয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে, বন্যা এবং ভূমিকম্প। বলা হয়ে থাকে ক্রমাগত বন্যা এই নগরকে ধ্বংস করেছে। বন্যা প্রতিরোধের কোন প্রকার ব্যবস্থা সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা গ্রহণ করতে পারেনি।

খ. বৈদেশিক আক্রমণ

পার্শ্ববর্তী বা বিদেশী আক্রমণকারীদের আক্রমণে ধ্বংস হয়েছে সিন্ধু সভ্যতা। এই আক্রমণকারী হিসেবে অনেকেই আর্যদের কথা বলেছেন। যাযাবর আর্যরা ভারতে প্রবেশ করে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। পূর্বোক্ত তারা উন্নত নগর সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতাকে ধ্বংস করে।

গ. আভ্যন্তরীণ সঙ্কট

অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের কারণে এই সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মনে করা হয় কৃষি উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল। বাণিজ্যও ভেঙ্গে পড়েছিল। এভাবে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়ে সিন্ধুসভ্যতা। সামরিক দিক থেকেও খুব সবল ছিল না সিন্ধুবাসীরা। এ সমস্ত সঙ্কটের কারণে ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকে এই সভ্যতা।

এসব কারণের মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছেন ২৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রলয়ঙ্করী বন্যা হয়েছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো প্লাবিত হয় এই বন্যায়। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো শহর এভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে, ক্রমাগত বন্যায় শহর দু'টি ধীরে ধীরে মাটির নীচে চাপা পড়েছে।

সার-সংক্ষেপ

সিন্ধু সভ্যতা ভারতের প্রাচীনতম নগর সভ্যতা। এই সভ্যতাটি কারা নির্মাণ করেছেন এটি স্বাভাবিকভাবেই একটি কৌতূহলের বিষয়। ফলে, ঐতিহাসিকগণ সিন্ধু সভ্যতার নির্মাতা কারা সে সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছেন। এক সময় মনে করা হতো আর্যরা সিন্ধু সভ্যতা নির্মাণ করেছিল। কিন্তু, বিভিন্ন যুক্তিতে প্রমাণিত হয়েছে সিন্ধু সভ্যতা গড়ার সাথে আর্যদের কোন ভূমিকা ছিল না। বিভিন্ন দিক বিচারে দ্রাবিড় জাতি সিন্ধু সভ্যতার নির্মাতা বলে ধারণা করা হয়। এমন একটি উন্নত সভ্যতা কিভাবে ধ্বংস হলো তা নিয়েও গবেষণা হয়েছে। অনেকগুলো কারণ বিবেচনা করা হয়েছে। এসব কারণ বিচারে মনে করা হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবং আর্যদের আক্রমণে সিন্ধু সভ্যতার পতন ঘটেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। সিন্ধু সভ্যতার প্রকৃত নির্মাতা–
   ক. আর্য জাতিগোষ্ঠী।
   খ. দ্রাবিড় জাতিগোষ্ঠী।
   গ. মঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠী।

২। সিন্ধু সভ্যতায় মৃতদেহকে প্রধানত–
   ক. আগুনে পোড়ানো হতো।
   খ. কবর দেয়া হতো।
   গ. নদীতে ভাসিয়ে দিতো।

৩। সিন্ধু সভ্যতায় পাওয়া মৃৎপাত্রের রং ছিল–
   ক. ধূসর।
   খ. বাদামী।
   গ. কালো-লাল।

৪। সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসকারী প্রলয়ঙ্করী বন্যা হয়েছিল–
   ক. ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

খ. ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।
গ. ২৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১। সিন্ধু সভ্যতার নির্মাতা কারা বর্ণনা করুন।
২। সিন্ধু সভ্যতার পতনের কারণসমূহ বর্ণনা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৩ : রচনামূলক প্রশ্ন

১। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সংস্কৃতির পরিচয় দিন। সিন্ধু সভ্যতা কতোদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল?
২। মহেঞ্জোদারোর শিল্পকলার পরিচয় দিন।
৩। সিন্ধু সভ্যতার অবস্থান ও সময়কাল উল্লেখপূর্বক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিন্ধু সভ্যতার অবদান আলোচনা করুন।
৪। সিন্ধু সভ্যাতার প্রকৃত নির্মাতা কারা? সিন্ধু সভ্যতার পতনের কারণসমূহ আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠ ৩.১ ঃ ১। খ ২। গ ৩। খ ৪। খ
পাঠ ৩.২ ঃ ১। ক ২। গ ৩। গ ৪। খ
পাঠ ৩.৩ ঃ ১। খ ২। খ ৩। ক ৪। গ
পাঠ ৩.৪ ঃ ১। খ ২। খ ৩। ক ৪। গ
পাঠ ৩.৫ ঃ ১। খ ২। খ ৩। গ ৪। গ